ইউনিট
৮

গবাদিপশুর রোগ ও চিকিৎসা

গবাদিপশু এদেশের গরীব কৃষক ও খামারিদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে প্রাণীসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান প্রায় ৬.৫%। আর জমি চাষ, পরিবহন, ফসল মাড়াই, সার ও জ্বালানির বিষয় বিবেচনা করলে এই অবদানের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৩%। মানুষ ও অন্যান্য জীবের ন্যায় প্রাণীসম্পদও রোগব্যাধির উর্ধ্বে নয়। তাই এরাও আক্রান্ত হতে পারে নানা ধরনের রোগব্যাধিতে। আর যথাসময়ে এসব রোগাক্রান্ত গবাদিপশুর রোগ নির্নয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এগুলোর মৃত্যু হয়ে কৃষি ও কৃষকের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। বর্তমানে চিকিৎসার অভাবে গবাদিপশু মারা গিয়ে প্রতিবছর এদেশে প্রায় দেড় হাজার কোটির টাকার কমবেশি সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। তাই প্রাণীরোগ সম্পর্কে কৃষক, খামারি ও প্রাণীসম্পদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সম্যক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া যথা সময়ে প্রাণীরোগ নির্ণয় করে এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই গবাদিপশু সুস্থ থাকবে। আর সুস্থ প্রাণী থেকে অধিক উৎপাদন পেয়ে কৃষক তথা দেশের অর্থনীতির চাকাও আরও দ্রুতগতিতে ঘুরবে।

ইউনিট ৮-এর বিভিন্ন পাঠে প্রাণীরোগের ধারণা, শ্রেণিবিন্যাস ও রোগ নির্ণয় পদ্ধতি; ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাকজনিত রোগ এবং পরজীবিঘটিত ও অপুষ্টিজনিত রোগ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৮.১

পশুরোগের ধারণা, শ্রেণিবিন্যাস ও রোগ নির্ণয় পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রোগের অর্থ ও সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- সুস্থ গবাদিপশুর বাহ্যিক লক্ষণগুলো খাতায় লিখতে পারবেন।
- গবাদিপশুর রোগের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন।
- গবাদিপশুর রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি অলোচনা করতে পারবেন।
- রোগ নির্ণয়ে গবাদিপশুর দেহের তাপমাত্রা, নাড়ির গতি ও শ্বাস-প্রশ্বাসের হারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

রোগের অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and Definition of Diseases)

শাব্দিক অর্থ বিবেচনা করলে ইংরেজি disease-এর বাংলা অর্থ হলো রোগ। Dis-অর্থ অভাব এবং ease-অর্থ easy বা আরাম। অতএব disease-অর্থ 'lack of ease' অর্থাৎ ‘আরামের’ অভাব। কাজেই বিভিন্ন শারীরিক, মানসিক ও পরিবেশগত কারণে মানুষসহ অন্যান্য জীব ও প্রাণীর দেহের এক বা একাধিক অঙ্গ বা তন্ত্রের অস্বাভাবিকতার কারণে স্বাভাবিক কার্যকলাপের ব্যঘাত ঘটাকেই রোগ বলা যায়। সাধারণভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় গবাদিপশুর দেহে যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায়, যদি কোন কারণে সেসব স্বাভাবিক লক্ষণের কোন পরিবর্তন ঘটে তবে তাকে আমরা রোগ বলতে পারি। অর্থাৎ গবাদিপশুর দেহের স্বাভাবিক অবস্থার যে কোন বিচ্যুতিই হলো রোগ।

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মতো আমাদের কৃষক ও খামারিদের অমূল্য গবাদিপশুও নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। গবাদিপশুর দেহের বিভিন্ন লক্ষণ দেখে সুস্থ ও অসুস্থ পশু শনাক্ত করা যায়। কাজেই সুস্থ গবাদিপশুর স্বাভাবিক আচরণ ও লক্ষণগুলো আমাদের জানা থাকলে সহজেই আমরা সুস্থ গবাদিপশু থেকে অসুস্থগুলোকে পৃথক করতে পারব। এখানে সুস্থ গবাদিপশুর বাহ্যিক লক্ষণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

সুস্থ গবাদিপশুর বাহ্যিক লক্ষণ (External Symptoms of Healthy Livestock)

একটি সুস্থ গবাদিপশুর বাহ্যিক লক্ষণগুলো নিম্নরূপঃ

১. গবাদিপশুটি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি সজাগ থাকবে।
২. নাক, মুখ ও চোখ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল থাকবে।
৩. শরীরের লোম মসৃণ ও চকচকে থাকবে।
৪. নাকের অগ্রভাগে বিন্দু বিন্দু ঘাম থাকবে।
৫. গবাদিপশু দ্রুত মাথ, কান ও লেজ নেড়ে মশামাছি তাড়াবে।
৬. খাওয়া-দাওয়া স্বাভাবিক থাকবে।
৭. শরীরের তাপ স্বাভাবিক থাকবে (গরু ঃ ১০১.৫°, মহিষ ঃ ১০৩°)।
৮. মলমূত্র স্বাভাবিক এবং এদের রং-ও স্বাভাবিক থাকবে।
৯. গবাদিপশু খাবারের পর স্বাভাবিকভাবে জাবর কাটবে।

১০. গবাদিপশুর কান খাড়া থাকবে।
১১. শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ির গতি স্বাভাবিক থাকবে।
১২. গবাদিপশু হাঁটার সময় স্বাভাবিকভাবে পা ফেলবে।
১৩. চার পায়ের উপর গবাদিপশু শিথিলভাবে দাঁড়াবে।

গবাদিপশুর রোগের শ্রেণীবিন্যাস (Classification of Livestock Diseases)

মানুষ বা অন্যান্য প্রণীর মতো বিভিন্ন কারণে গবাদিপশুর রোগ হতে পারে। রোগ সৃষ্টির কারণের উপর ভিত্তি করে গবাদিপশুর রোগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যেতে পারে। যেমন–

১. **জীবাণুঘটিত রোগ (Infectious Diseases)ঃ** বিভিন্ন ধরনের জীবাণু বা অনুজীবের আক্রমণের ফলে গবাদিপশুতে সেসব রোগের সৃষ্টি হয় সেগুলোকে জীবাণুঘটিত রোগ বলে। যেমন–
   ক. **ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ (Bacterial Diseases)ঃ** ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে গবাদিপশুতে রোগের সৃষ্টি হলে তাকে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ বলে। যেমন- গলাফোলা, তড়কা, বাদলা, বাছুরের সাদা বাহ্য, ওলানপ্রদাহ ইত্যাদি।
   খ. **ভাইরাসজনিত রোগ (Viral Diseases)ঃ** ভাইরাসের আক্রমণে গবাদিপশুতে রোগের সৃষ্টি হলে তাকে ভাইরাসজনিত রোগ বলে। যেমন– ক্ষুরারোগ, জলাতংক, গোবসন্ত ইত্যাদি।
   গ. **ছত্রাকজনিত রোগ (Fungal Diseases)ঃ** এককোষি ঈস্ট ও বহুকোষি মোল্ডের আক্রমণে গবাদিপশুতে রোগের সৃষ্টি হলে তাকে ছত্রাকজনিত রোগ বলে। যেমন– দাদ, থ্রাস ইত্যাদি।
   ঘ. **মাইকোপ-াজমাজনিত রোগ (Mycoplasmal Diseases)ঃ** মাইকোপ্লাজমা নামক অনুজীবের আক্রমণে গবাদিপশুতে রোগের সৃষ্টি হলে তাকে মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ বলে। যেমন– মাইকোপ্লাজমোসিস, আর্থাইটিস, নিউমোনিয়, ওলানপ্রদাহ ইত্যাদি।
   ঙ. **রিকেটশিয়জনিত রোগ (Ricktial Diseases)ঃ** রিকেটশিয়া নামক অনুজীবের আক্রমণে গবাদিপশুতে রোগের সৃষ্টি হলে তাকে মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ বলে। যেমন- রকি মাউন্টেন স্পটেট ফিভার, লাউস-বর্ন টাইফাস ইত্যাদি।
   চ. **ক্ল্যামাইডিয়াজনিত রোগ (Chlamydial Diseases)ঃ** ক্ল্যামাইডিয়া নামক অনুজীবের আক্রমণে গবাদিপশুতে রোগের সৃষ্টি হলে তাকে ক্ল্যামাইডিয়াজনিত রোগ বলে। যেমন– ক্ল্যামাইডিওসিস, ক্ল্যামাইডিয়াল নিউমোনিয়া, ক্ল্যামাইডিয়াজনিত গর্ভপাত ইত্যাদি।

২. **পরজীবিঘটিত রোগ (Parasitic Diseases)ঃ** বিভিন্ন ধরনের পরজীবির আক্রমণের ফলে গবাদিপশুতে সেসব রোগের সৃষ্টি হয় সেগুলোকে পরজীবিঘটিত রোগ বলে। যেমন–
   ক. **প্রোটোজোয়াজনিত রোগ (Protozoal Diseases)ঃ** এককোষি প্রোটোজোয়ার আক্রমণে গবাদিপশুতে রোগের সৃষ্টি হলে তাকে প্রোটোজোয়াজনিত রোগ বলে। যেমন– ককসিডিওসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, বেবেসিয়াসিস, সারা, ইত্যাদি।
   খ. **অন্তঃপরজীবিঘটিত রোগ (Infestation of Internal Parasites)ঃ** দেহাভ্যন্তরে অবস্থানকারী বিভিন্ন ধরনের কৃমির কারণে রোগের সৃষ্টি হলে তাকে অন্তঃ পরজীবিঘটিত বা কৃমিজনিত রোগ বলে। যেমন– গোলকৃমি, বক্রকৃমি, সুতাকৃমি, পাতাকৃমি, ফিতাকৃমি ইত্যাদির আক্রমণ।

গ. **বহিঃপরজীবিঘটিত রোগ (Infestation of External Parasites)ঃ** গবাদিপশুর দেহের বাহিরে অবস্থানকারী বিভিন্ন ধরনের পরজীবির কারণে রোগের সৃষ্টি হলে তাকে বহিঃপরজীবিঘটিত রোগ বলে। যেমন– আটালি, উকুন, মাছি, মেন্‌জ, কেড্‌স, ফ্লি ইত্যাদিজনিত রোগ।

পুষ্টি উপাদানের অভাবে গবাদিপশু রোগাক্রান্ত হলে তাকে অপুষ্টিজনিত রোগ

৩. **অপুষ্টিজনিত রোগ (Nutritional Diseases)ঃ** বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদানের অভাবে গবাদিপশু রোগাক্রান্ত হলে তাকে অপুষ্টিজনিত রোগ বলে। যেমন– ভিটামিন ও খণিজপদার্থ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত রোগ।

৪. **বিপাকীয় রোগ (Metabolic Diseases)ঃ** বিপাকীয় গোলযোগের কারণে গবাদিপশু রোগাক্রান্ত হলে তাকে বিপাকীয় রোগ বলে। যেমন– দুগ্ধজ্বর, কিটোসিস ইত্যাদি।

৫. **বিষক্রিয়াজনিত রোগ (Diseases caused by Poison)ঃ** বিভিন্ন ধরনের জৈব ও অজৈব বিষের কারণে বা বিষাক্ত খাদ্যদব্য, ঘাসপাতা ইত্যাদির কারণে গবাদিপশু রোগাক্রান্ত হলে তাকে বিষক্রিয়াজনিত রোগ বলে। যেমন- নাইট্রেট, নাইট্রাইট, সায়ানাইড ইত্যাদি।

৬. **সাধারণ ও অন্যান্য রোগ (General & Other Diseases)ঃ** উপরোক্ত রোগগুলো ছাড়া বাদবাকি রোগগুলোকে এই শ্রেণীর অধীনে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। যেমন- পোড়া, ক্ষত, উদরাময়, পেটফাঁপা, জ্বর, জন্ডিস ইত্যাদি।

গবাদিপশুর রোগ নির্ণয় (Diagnosis of Livestock Diseases)

রোগাক্রান্ত গবাদিপশুকে চিকিৎসা করার আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করতে হয়। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগের ইতিহাস, রোগাক্রান্ত প্রাণী পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। এখানে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ক) **রোগের ইতিহাসঃ** রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগের ইতিহাস জানা অত্যন্ত জরুরি। চিকিৎসার পূর্বে এসব তথ্য পশুর মালিকের নিকট থেকে জেনে নেয়া প্রয়োজন। যেমন-

১। কোন দিন থেকে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।
২। আক্রান্ত পশু পানি বা অন্যান্য খাবার খায় কি-না ও জাবর কাটে কি-না।
৩। আক্রান্ত পশুর পায়খানার ধরন কেমন?
৪। খামারের আশপাশে কোথাও এ রোগ দেখা দিয়েছে কি-না ইত্যাদি।

খ) **আক্রান্ত পশু পর্যবেক্ষণঃ** অসুস্থ পশুকে দূর থেকে প্রাণীচিকিৎসকের কাছে এনে পরীক্ষা করার আগে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেয়া ও দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জেনে নেয়া প্রয়োজন-

১। অসুস্থ পশুর অবস্থা ও আচরণ।
২। আক্রান্ত পশুর দেহের ভঙ্গি, যেমন– দাঁড়ানো, শোয়া বা চলার ভঙ্গি ইত্যাদি
৩। আক্রান্ত পশুর নাক, মুখ বা চোখ থেকে স্রাব (তরল পদার্থ) ঝরে কি-না।

গ) **আক্রান্ত পশুর পরীক্ষাঃ** আক্রান্ত পশুটিকে পর্যবেক্ষণের পর নিম্নলিখিত কয়েকটি পরীক্ষা করে নিতে হবে। যেমন–

১। নাড়ির গতি নির্ণয়
২। শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়
৩। শ্বাস-প্রশ্বাসের হার নির্ণয়
৪। বিভিন্ন অঙ্গ পরীক্ষা

এগুলো ছাড়াও আক্রান্ত পশুর দেহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অংশ, যেমন রক্ত, মল, মূত্র, কোষকলা, স্রাব ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।

গবাদিপশুর দেহের তাপমাত্রা নির্ণয়

প্রাণীদেহের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে বিভিন্ন ধরনের রোগ নির্ণয় করা যায়।

গবাদিপশু উষ্ণরক্তবাহী (Homeothermic) প্রাণী হওয়ায় যে কোন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দেহের তাপমাত্রার তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। পশু সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলেই সাধারণত দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। দেহের বাহ্যিক তাপমাত্রা অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার চেয়ে অনেক কম। তাই গবাদিপশুর দেহাভ্যন্তারের প্রকৃত তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয়।

প্রাণীদেহের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে বিভিন্ন ধরনের রোগ নির্ণয় করা যায়। রোগ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে শরীরের তাপমাত্রার তারতম্য হতে পারে। যেমন−

১. দিনের প্রথমভাগে তাপমাত্রা কম হয়, আর শেষদিকে বেশি হয়।
২. গবাদিপশু ডাক আসলে বা গরম হলে এবং গর্ভকালের শেষদিকে তাপমাত্রা বেড়ে যায়।
৩. অত্যধিক পরিশ্রম করলে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।
৪. খাদ্য গ্রহণের পরপরই তাপমাত্রা বাড়ে, আবার পানি খাওয়ালে তাপমাত্রা কমে।
৫. ক্ষুদ্রকার পশুর দেহের তাপমাত্রা বৃহদাকার প্রাণীর চেয়ে বেশি থাকে।
৬. গর্ভবতী ও অল্প বয়স্ক প্রাণীর তাপমাত্রা গর্ভহীন ও অধিক প্রাণী অপেক্ষা বেশি থাকে।

তাপমাত্রা নির্ণয়ের পরিবেশঃ

১. ছায়াতে বিশ্রামরত অবস্থায় শান্ত পরিবেশে তাপমাত্রা নেয়া উচিত।
২. প্রখর রৌদ্র বা বৃষ্টির মধ্যে থাকা অবস্থায় গবাদিপশুর তাপমাত্রা নেয়া উচিত নয়।
৩. দীর্ঘপথ হাটা বা দৌড়ানোর পর ক্লান্ত অবস্থায় তাপমাত্রা নির্ণয় করা সঠিক নয়।
৪. পশু উত্তেজিত অবস্থায় থাকলে স্বাভাবিক তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায় না।

তাপমাত্রা দেখার নিয়ম

গবাদিপশুর মলদ্বারে থার্মোমিটার প্রবেশ করিয়ে কমপক্ষে এক মিনিটকাল রেখে বের করে নিতে হয়। এরপর থার্মোমিটারে পারদের মাপ দেখে তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায়। সারণি ৮.১.১-এ গবাদিপশুর দেহের স্বভাবিক তাপমাত্রা উল্লেখ করা হয়েছে।

সারনি ৮.১.১ঃ পশুর শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা

গবাদিপশুর প্রজাতি	তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)	তাপমাত্রা (ফারেনহাইটে)
১. গরু	৩৮.০°-৩৯.৩°	১০০.৪°-১০২.৮°
২. ঘোড়া	৩৭.২°-৩৮.১°	৯৯.০°-১০০.৬°
৩. ভেড়া	৩৮.৩°-৩৯.৯°	১০০.৯°-১০৩.৮°
৪. ছাগল	৩৮.৫°-৩৯.৭°	১০১.৩°-১০৩.৫°
৫. কুকুর	৩৭.৯°-৩৯.৯°	১০০.২°-১০৩.৮°
৬. বিড়াল	৩৮.১°-৩৯.২°	১০০.৫°-১০২.৫°
৭. উট	৩৪.২°-৪০.৭°	৯৩.৬°-১০৫.৩°
৮. গাধা	৩৬.৪°-৩৮.৪°	৯৭.৫°-১০১.১°
৯. শুকর	৩৮.৭°-৩৯.৮°	১০১.৬°-১০৩.৬°

উৎসঃ Swenson, M. J. (1977). *Duke's Physiology of Domestic Animals (9th Ed.),* Comstock Publishing Associates, Ithaka-London. p 687.

পশুর নাড়ির গতি নির্ণয়

পশুর দেহের নির্দিষ্ট ধমনি থেকে নাড়ির গতি নির্ণয় করা হয়।

সঠিকভাবে রোগ নিরূপনের জন্য নড়ির গতি (Pulse) নির্ণয় অপরিহার্য। প্রাণীর দৈহিক গঠনের তারতম্যে নাড়ীর গতিরও তারতম্য হতে পারে। বিভিন্ন প্রজাতির গবাদিপশুতে নাড়ির গতি নির্ণয় করার স্থান ও প্রযুক্তিগত কৌশল ভিন্ন। পশুর দেহের নির্দিষ্ট ধমনি থেকে নাড়ির গতি নির্ণয় করা হয়। গবাদিপশুর চোঁয়ালের ধমনীতে বা উরুর ভেতরের দিকের ধমনীতে আঙ্গুলের মাধ্যমে মৃদু চাপ দিয়ে নাড়ীর গতি নির্ণয় করা যায়।

সাধারণত কম বয়সের গবাদিপশুর নাড়ির গতি বেশি থাকে এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা কমতে থাকে। আবার রোগব্যাধির কারণে নাড়ির গতি বেড়ে যেতে পারে। এ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে সুস্থ পশুর নাড়ির গতি বাড়তে পারে। যেমন- গর্ভকালের শেষদিকে, পশু গরম হলে, উত্তেজনার কারণে, অধিক পরিশ্রম করলে ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রজাতির গবাদিপশুর স্বাভাবিক নাড়ির গতি সারণি ৮.১.২-এ দেখানো হয়েছে।

পশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের হার নির্ণয়

কোন প্রাণী বা পশু ফুসফুসের সম্প্রসারণের সময় শ্বাস গ্রহণ করে এবং সংকোচনের সময় শ্বাস ত্যাগ করে। প্রতি মিনিটে ফুসফুস কতবার প্রসারিত বা সংকুচিত হয় অর্থাৎ কতবার শ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ করে সেটিই হলো শ্বাস-প্রশ্বাসের হার। শ্বাস-পশ্বাসের হার পরীক্ষা করে পশুর রোগ নির্ণয় করা যায়। মেদপূর্ণ পশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা বেশি হয়। পাকস্থলী বেশি পূর্ণ থাকলে, গর্ভবতী বা অধিক পরিশ্রান্ত হলে অথবা পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে পশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে।

পশুকে শান্তভাবে দাঁড় করিয়ে দূর থেকে পেট ও বুকের ওঠানামা গণনা করে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার নির্ণয় করা যায়। পশুর নাকের সামনে হাত ধরে প্রতি মিনিটে কতবার শ্বাস ত্যাগ হচ্ছে, তা গণনা করে শ্বাস-প্রশ্বাস হার নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন প্রজাতির গবাদিপশুর স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের হার সারণি ৮.১.২-এ দেখানো হয়েছে।

সারনি ৮.১.২ঃ বিভিন্ন প্রজাতির গবাদিপশুর নাড়ির স্বাভাবিক গতি এবং শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হার

গবাদিপশুর প্রজাতি	নাড়ির গতি (প্রতি মিনিটে)	শ্বাস-প্রশ্বাস হার (প্রতি মিনিটে)
১. গরু	৬০-৮০	১০-৩০
২. ঘোড়া	৩০-৪০	৮-১০
৩. মহিষ	৪০-৬০	১২-১৬
৪. ভেড়া	৭০-৯০	১০-২০
৫. ছাগল	৭০-৯০	২৫-৩৫
৬. শুকর	৬০-৯০	১০-২০
৭. কুকুর	৬০-৯০	১৫-৩০
৮. বিড়াল	১১০-১৩০	২০-৩০

উৎসঃ সামাদ, এম. এ. (১৯৯৬)। পশুপালন ও চিকিৎসাবিদ্যা, লিরিক-এপিক প্রকাশনী, ময়মনসিংহ, পৃ. ১৩৫।

সারমর্ম

গবাদিপশুর দেহের স্বাভাবিক অবস্থার যে কোন বিচ্যুতিই হলো রোগ। সুস্থ গাবাদিপশুর বাহ্যিক লক্ষণগুলো জানা থাকলে অসুস্থ পশুর রোগ শণাক্ত করতে সুবিধা হবে। পশুর রোগব্যাধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে হলে গবাদিপশুর রোগের শ্রেনিবিন্যাস জানা প্রয়োজন। গবাদিপশুর রোগের ইতিহাস, আচরণ, লক্ষণ ইতঅদি তথ্য রোগ নির্ণয়ে সহায়ক হবে। তাছাড়া দেহের তাপমাত্রা, নাড়ির গতি ও শ্বাস-প্রশ্বাসের হার প্রাথমিকভাবে গবাদিপশুর রোগ নির্ণয় করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গরুর নাড়ির গতি প্রতি মিনিটে কত?
ক) ৬০-৮০
খ) ৮০-১০০
গ) ১০০-১২০
ঘ) ১২০-১৪০

২. কোনটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ?
ক) তড়কা
খ) জলাতংক
গ) ক্ষুরা রোগ
ঘ) দাদ

৩. ককসিডিওসিস কোন ধরনের রোগ?
ক) প্রোটোজোয়াঘটিত
খ) ব্যাকটেরিয়াল
গ) ভাইরাসজনিত
ঘ) অপুষ্টিজনিত রোগ

পাঠ ৮.২

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাকজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গবাদিপশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ সম্পর্কে অলোচনা করতে পারবেন।
- গবাদিপশুর ভাইরাসজনিত গুরুত্বপূর্ণ রোগের নাম, কারণ, লক্ষণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- গবাদিপশুর ছত্রাকজনিত রোগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

গবাদিপশুর ভাইরাসজনিত রোগ

এদেশে গবাদিপশুর ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগগুলোর মধ্যে ক্ষুরা রোগ, বসন্ত, জলাতঙ্ক ও গোবসন্তবা রিন্ডারপেস্ট ইত্যাদি প্রধান। এখানে গবাদিপশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাইরাসজনিত রোগের পরিচিতি, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১. ক্ষুরা রোগ (Foot and Mouth Disease)

ক্ষুরা রোগ একটি অতি তীব্র প্রকৃতির ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত প্রাণীর মুখ ও পায়ে ঘা হওয়ার ফলে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না ও খুঁড়িয়ে হাঁটে।

ক্ষুরা রোগ একটি অতি তীব্র প্রকৃতির ভাইরাসজনিত রোগ। সকল বিভক্ত ক্ষুরবিশিষ্ট প্রাণী এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদিতে হয়। তবে গরু সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। এ রোগে আক্রান্ত প্রাণীর মুখ ও পায়ে ঘা হওয়ার ফলে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না ও খুঁড়িয়ে হাঁটে। পৃথিবী প্রায় সব দেশেই এ রোগটি দেখা গেলেও বাংলাদেশে বিশেষত গরুতে প্রাদুর্ভাব বেশি। এদেশের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুরা রোগের বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক আঞ্চলিক নাম রয়েছে। যেমন- বাতা, তাপা, ঝরা, ক্ষুর পাকা, ক্ষুরাচল ইত্যাদি। রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শ, খাদ্যদ্রব্য, ব্যবহৃত পানি ও ব্যবহার্য অন্যান্য দ্রব্যের মাধ্যমে এ রোগের সংক্রমণ হয়। তাছাড়া বাতাসের মাধ্যমেও এ রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে। উন্নত ও সংকর জাতের গরু এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পশু সুস্থ হওয়ার পরও রোগজীবাণু বহন করে।

রোগের কারণঃ

ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ (Foot and Mouth Disease) নামক এক ধরনের পিকরনা ভাইরাস এজন্য দায়ী। এই ভাইরাসের মোট ৭টি টাইপ রয়েছে। যেমন– এ, ও, সি স্যাট-১, স্যাট-২, স্যাট-৩ এবং এশিয়া-১। বাংলাদেশে ও এবং এশিয়া-১ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বেশি। ক্ষুরা একটি মারাত্মক ছোঁয়াছে রোগ।

রোগের লক্ষণঃ

১. প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত প্রাণীর দেহের তাপমাত্রা ১০৪°-১০৬° ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে।
২. জিহ্বা, মুখের ভেতর, পায়ের ক্ষুরার মাঝখানে, গাভীর ওলানে ইত্যাদিতে ফোস্কা ওঠে ও পরে তা ফেটে গিয়ে ঘায়ের সৃষ্টি হয়।

৩. মুখ দিয়ে অনবরত লালা পড়ে, আর এর ফলে ঘাস বা অন্য কোন খাবার খেতে পারে না।
৪. পায়ের খুরে ঘা হওয়াতে আক্রান্ত পশু খোঁড়াতে থাকে।
৫. রুগ্ন পশুতে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।
৬. আক্রান্ত পশু জিহ্বা দিয়ে পায়ের ক্ষুরের ঘা চাঁটতে থাকে ও মাঝে মাঝে পা ছুঁড়ে মারে।
৭. আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, মুখ দিয়ে লালা পড়ে ও পা অনেক সময় উঁচু করে রাখে।
৮. ক্ষতে মাছি পড়ে ও তা থেকে পোকার মতো বড় বড় শূককীট বের হয়।
৯. মুখ থেকে চপ চপ শব্দ বের হয়।
১০. দিনে দিনে পায়ের ক্ষুর খসে পড়ে ও পশু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।

চিকিৎসা বা প্রতিকারঃ

১. পশুকে ছায়াযুক্ত শুকনা জায়গায় রাখতে হয় ও নরম খাদ্য, যেমন– ভাতের মাড়, জাউ ইত্যাদি খেতে দিতে হবে।
২. ক্ষতস্থান স্যাভলন, ডেটল ইত্যাদি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।
৩. পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (০.১% সলিউশন) বা ফিটকিরি (২% সলিউশন) দিয়ে ক্ষতস্থান দিনে ২-৩ বার ধুয়ে গি- সারিন বা মধুতে ২% পরিমাণ বোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে লাগাতে হবে।
৪. নারিকেল ও তারপিন তেল ৪ঃ১ অনুপাতে মিশিয়ে ঘায়ে লাগাতে হবে।
৫. মুখ ও পায়ের ঘা খাবার সোডা মেশানো পানি দিয়ে দিনে ৩-৪ বার ধুয়ে দিতে হবে।

কোন স্থানে ক্ষুরারোগ দেখা দিলে আক্রান্ত পশুকে মেরে মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হয়।

রোগপ্রতিরোধঃ

১. এই রোগে আক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু থেকে আলাদা করে রাখতে হয়।
২. খামার বা গোয়াল ঘর ও ঘরে ব্যবহৃত জিনিসপত্র জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
৩. রোগ দেখা দেয়ার পরপরই আশেপাশের সুস্থ গবাদিপশুগুলোকে টিকা দিতে হবে।
৪. পৃথিবীর অনেক দেশ থেকেই ক্ষুরারোগ নির্মূল করা হয়েছে। এসব দেশে হঠাৎ কোন স্থানে ক্ষুরারোগ দেখা দিলে আক্রান্ত পশুকে মেরে মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এ রোগের প্রার্দভাব ব্যপক বলে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়।
৫. গবাদিপশুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

২. গোবসন্ত রোগ (Rinderpest)

রোগের কারণঃ

গোবসন্ত একটি ভাইরাসজনিত অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া এ রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগ সাধারণত মহামারী আকারে দেখা দেয়।

রোগের লক্ষণঃ

১. গোবসন্তে আক্রান্ত গরুর দেহের তাপমাত্রা বেড়ে ১০৪°-১০৫° ফারেনহাইট হয়।
২. আক্রান্ত গরু নির্জীব হয়ে পড়ে; আহার ও জাবরকাটা বন্ধ করে দেয়।
৩. পিপাসা অত্যধিক বেড়ে যায়।
৪. দুগ্ধবতী গাভীর দুধ দ্রুত কমে যায়।

৫. নাক ও চোখ থেকে জলীয় স্রাব নির্গত হয়।
৬. জ্বরের ২-৪ দিনের মধ্যে মুখের ভেতরটা লাল হয়ে ওঠে।
৭. ঠোঁট ও গলার ভেতরে, দাঁতের মাঁড়িতে ও জিহ্বার নিচে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি দেখা দেয়।
৮. আক্রান্ত গরুর কাছে গেলে নাকে উৎকট গন্ধ লাগে।
৯. রোগের প্রথম দিকে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয় ও ৩-৪ দিন পর পাতলা পায়খানা হয় এবং পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ে।
১০. আক্রান্ত গরুকে দাঁড় করালে পৃষ্ঠদেশ নিচের দিকে বেঁকে যায়।
১১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রান্ত গরু ৭-১০ দিনের মধ্যে মারা যায়।

চিকিৎসা বা প্রতিকারঃ

১. একবার গরু এই রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা করে কোন সুফল পাওয়া যায় না। তাই আক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রতিষেধক টিকা দিতে হয়।
২. আক্রান্ত গরুকে পরিষ্কার পানি ও তরল খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।
৩. আক্রান্ত হওয়ার প্রথম দিকে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে বলে তিসির খৈল খাওয়াতে হবে।
৪. পরে পাতলা পায়খানা হয় বলে চাল সিদ্ধ খুব পাতলা করে পানির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ভালো হয়।
৫. আক্রান্ত পশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং এর শরীর ঢেকে রাখতে হবে।

রোগপ্রতিরোধঃ

১. নিয়মিতভাবে প্রতিবছর সুস্থ গরুগুলোকে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।
২. সুস্থ ভালো গরুগুলোকে আক্রান্ত গরু হতে দূরে রাখতে হবে।
৩. আক্রান্ত গরুর পরিচর্যার জন্য যেসব পাত্র ব্যবহার করা হয় তা জীবাণুনাশক দিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে শোধিত করে নিতে হবে।
৪. আক্রান্ত পশুর স্রাব বা মলমুত্র ভালোভাবে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
৫. আক্রান্ত গরু মারা গেলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটিতে গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হয়।

৩. জলাতঙ্ক রোগ (Rabies)

রোগের কারণঃ

এটি একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। রেবিস নামক একপ্রকার ভাইরাস এ রোগ সৃষ্টি করে। এটি একটি বুলেট আকৃতির ভাইরাস। কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী এই ভাইরাসের জীবাণু বহন করে। এই ভাইরাসে আক্রান্ত কুকুরের কামড়ে লালার মাধ্যমে গবাদিপশু আক্রান্ত হয়। এদেশের ৯৫% জলাতঙ্ক রোগ কুকুরের কামড়ে হয়ে থাকে। সাধারণত কামড়ের ৭-১০ দিন পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রোগের লক্ষণঃ

১. আক্রান্ত পশুতে পাগলামি ভাব দেখা দেয়, এমনকি আক্রমণ করতে তেড়ে আসে।
২. মুখ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে ও আস্তে আস্তে পক্ষাঘাত দেখা দেয়।
৩. আক্রান্ত পশু নিস্তেজ হয়ে পড়ে, খাবার খেতে চায় না।
৪. পশুর নিচের চোয়াল ঝুলে যায় ও জিহ্বা বের হয়ে আসে।

৫. পশু দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না বলে মাটিতে শুয়ে পড়ে ও অবশেষে মারা যায়।
৬. সাধারণত জলাতঙ্কে আক্রান্ত প্রাণীর কামড়ের ৭-১০ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।
৭. ঘনঘন প্রস্রাব করে ও পুরুষ পশুতে সাময়িকভাবে অতিরিক্ত যৌনানুভূতি দেখা যায়।
৮. লেজ নিশ্চল হয়ে পড়ে ও ডান-বামে স্থানচ্যুত হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধঃ

১. যেহেতু জীবাণু খুব দ্রুত মস্তিষ্কের স্নায়ুমন্ডলকে আক্রমণ করে তাই এই রোগের সঠিক কোন চিকিৎসা নেই।
২. প্রাথমিকভাবে কামড়ানোর স্থান সাবান বা সাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।
৩. রোগজীবাণু বহনকারী রাস্তার নেড়ি কুকুরগুলোকে নিয়মিত টিকা দিতে হবে।
৪. রোগপ্রতিরোধের জন্য পোষা কুকুরগুলোকে নিয়মিত টিকা দিতে হবে।
৫. ক্ষতস্থান ধোয়ার পর তাড়াতাড়ি আক্রমণোত্তর টিকা দিতে হবে।
৬. এই রোগ প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত পশুকে প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে।

৪. ছাগল-ভেড়ার বসন্ত রোগ (Goat and Sheep Pox)

রোগের কারণঃ

Goat Pox Virus এবং Sheep Pox Virus যথাক্রমে ছাগল ও ভেড়ায় বসন্ত রোগ সৃষ্টি করে। এটি একটি অত্যন্ত মারাত্নক সংক্রামক রোগ। পশুর ব্যবহার্য জিনিসপত্র, খাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে জীবাণু ছড়িয়ে রোগের সৃষ্টি করে থাকে। এদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ভারতের সীমানা বরাবর এ রোগটি বেশি দেখা যায়।

রোগের লক্ষণঃ

১. শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পায়।
২. চোখ, নাক, কান ও ত্বকে, বসন্তের গুটি বের হয় ও পরবর্তীতে গুটিগুলো লালচে রং ধারণ করে।
৩. গুটিতে ক্ষত সৃষ্টি হয় ও শেষ পর্যন্ত ছাগল মারা যায়।
৪. চোখের পাতা ফুলে যায়, নাক দিয়ে পানি ঝরে ও নাকে ঘা হয়।
৫. চামড়ার উপরের অংশ ওঠে যায় ও শক্ত স্কার সৃষ্টি হয়।

রোগপ্রতিরোধঃ

১. আক্রান্ত পশুকে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ বা সংগনিরোধ করা।
২. পশুকে নিয়মিত টিকা দিতে হবে।
৩. রোগজীবাণু বহনকারী মাধ্যমকে প্রতিরোধ করে রোগ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৪. রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া পশুকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।

৫. ছাগলের পিপিআর (Pestedes Petits Ruminants) রোগ

রোগের কারণঃ

এটা একটি ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। আক্রান্ত পশুর মলমূত্র, খাদ্য, পানীয় ও ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্যাদির মাধ্যমে এবং বাতাসের সাহায্যে এই রোগের জীবাণু ছড়িয়ে রোগের সৃষ্টি করে। বয়স্ক ছাগল অপেক্ষা বাচ্চা ছাগল এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণঃ

১. প্রথমে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় ও অল্প অল্প জ্বর হয়।
২. মুখে ও খাদ্যনালীতে ঘা হয় ও তা থেকে রক্ত ক্ষরণ হয়।
৩. পায়খানা প্রথমে শক্ত ও পরে পাতলা হয়।
৪. মুখে দুর্গন্ধ এবং শ্বাস কষ্ট হয়।
৫. নাক ও চোখ দিয়ে তরলপদার্থ নিঃসৃত হয়।
৬. পশু খাওয়া বন্ধ করে দেয়।
৭. রোগের প্রচন্ডতায় প্রথমে ডায়রিয়া ও পরে নিউমোনিয়া দেখা দেয়।
৮. কণ্ঠনালী ও পরিপাক নালীতে প্রদাহ ও রক্তক্ষরণ ঘটে।
৯. রক্ত মিশ্রিত তরল পায়খানা হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধঃ

১. রোগ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
২. সুস্থ পশুকে নিয়মিত রোগপ্রতিরোধী টিকা প্রদান করতে হবে।
৩. পশুর স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালনের ব্যবস্থা করতে হয়।
৪. আক্রান্ত ছাগলগুলো সুস্থগুলো থেকে আলাদা রাখতে হবে।

গবাদিপশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ

এদেশে গবাদিপশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগগুলোর মধ্যে বাদলা, তড়কা, গলাফোলা, ওলানপ্রদাহ, বাছুরের নিউমোনিয়া, নাভিপচা রোগ, ডিপথেরিয়া, সাদা বাহ্য ইত্যাদিই প্রধান। এখানে এদেশের গবাদিপশুকে আক্রান্তকারী প্রধান প্রধান ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগগুলোর পরিচিতি, লক্ষণ ও প্রতিকার সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. তড়কা রোগ (Anthrax)

রোগের কারণঃ

ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস *(Bacillus anthracis)* নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এই রোগ হয়। তড়কা রোগের অন্যান্য প্রচলিত নাম হল ধড়কা, উবাল মুড়কি, পলি বা তীলাজ্বর। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। সকল জীবজন্তু এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পশুপাখির খাদ্য, যেমন– মাংস, দুষিত পানি, ঘাস, খড় প্রভৃতির মাধ্যমে রোগজীবাণু সংক্রমিত হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণঃ

১. আক্রান্ত পশুর দেহের তাপত্রা ১০৬°-১০৭° ফারেনহাইট হয়ে থাকে।
২. পশুর দেহের লোম খাড়া হয়ে যায়, দেহ কাঁপতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর হয়।
৩. রোগের তীব্রতায় জ্বরের কারণে পশু খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়।
৪. তীব্র আক্রমণে অনেক সময় নাক, মুখ, প্রস্রাব ও মলদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়।
৫. অত্যধিক আক্রমণে পশু মাটিতে শুয়ে পড়ে ও ভীষণভাবে পা পেটের দিকে ছোঁড়াছুঁড়ি করতে থাকে।
৬. আক্রমণ মারাত্মক হলে মলদ্বার, কান ও নাক দিয়ে রক্ত পড়ে।
৭. পশু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ে ও শরীরে খিঁচুনী দিয়ে পরে মারা যায়।
৮. গরু বারবার পাতলা পায়খানা করে।

৯. রোগের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মল আলকাতরার মতো হয়ে যায়।
১০. রোগের স্থায়িত্বকাল আধা ঘন্টা থেকে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত।
১১. সবশেষে আক্রান্ত গরু মারা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধঃ

১. এই রোগ চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিসিরাম ব্যবহার করা যেতে পারে।
২. তবে তীব্রভাবে আক্রান্ত প্রাণীর রোগলক্ষণ প্রকাশের পর সাধারণত চিকিৎসার আর তেমন সুযোগ থাকে না।
৩. এই রোগ দমনের জন্য রোগাক্রমণের আগেই প্রতিষেধক টিকা দিয়ে নিতে হয়।
৪. আক্রান্ত পশুর ব্যবহার্য জিনিসপত্র জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
৫. এ রোগ ছোঁয়াচে বলে আক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু থেকে আলাদা রাখতে হবে।
৬. মৃত পশুকে মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে বা আগুনে পোড়াতে হবে।
৭. মৃত পশুর গোয়াল ঘরকে ১০% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করলে জীবাণুর মৃত্যু ঘটবে।
৮. রোগপ্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পালন ব্যবস্থাগুলো অনুসরণ করতে হবে।

২. বাদলা রোগ (Black Quarter or Black Leg)

রোগের কারণঃ

বর্ষাকালে এদেশের গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি এ রোগে আক্রান্ত হয় বলে একে বাদলা রোগ বলে। ক্লসট্রিডিয়াম চোভিয়াই *(Clostradium chauvaei)* নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগটি হয়ে থাকে। সাধারণত ৩ মাস থেকে ২ বছর বয়সের গরুতেই এ রোগ বেশি হয়। দেহের ক্ষতস্থান ও মলের মাধ্যমে রোগজীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।

রোগের লক্ষণঃ

১. এই রোগ হঠাৎ করে হয়; প্রথম দিকে গরুর গায়ে খুব জ্বর হয় (১০৫°-১০৭° সে.)।
২. আক্রান্ত পশুর ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়।
৩. চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়তে থাকে ও লোম খাড়া হয়ে যায়।
৪. দেহের যে কোন অঙ্গ অবশ ও ঘাড় ফুলে যেতে পারে; ফোলাস্থানে চাপ দিলে পচপচ শব্দ হয়।
৫. আক্রান্ত পশু হাঁটতে পারে না বা খুঁড়িয়ে হাঁটে।
৬. পশুর পায়খানা শক্ত হয়ে যায় ও জাবরকাটা বন্ধ করে দেয়।
৭. আক্রান্ত স্থান অনেক সময় কালো বর্ণ ধারণ করে।
৮. দেহের মাংসল অংশ ফুলে যায় ও হাঁটতে কষ্ট হয়।
৯. পিঠ কুঁজো হয়ে যায়, পশু হাঁটতে চায় না।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধঃ

১. রোগ লক্ষণ দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
২. আক্রান্ত পশুর শিরা বা ত্বকের নিচে ১০০-২০০ মিলি হিসেবে অ্যান্টিব্ল্যাকলেগ সিরাম ইনজেকশন দিতে হবে।
৩. তাছাড়া প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শমতো নির্ধারিত মাত্রায় অ্যান্টি-বায়োটিক প্রয়োগ করা যেতে পারে।
৪. আক্রান্ত পশুর লালা এবং মলমূত্র মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে।

৫. গরুকে সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
৬. সময়মত টিকা ব্যবহারের মাধ্যমে এ রোগ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৭. স্বাস্থ্যসম্মত বিধি ব্যবস্থার মাধ্যমে এ রোগ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. গলাফোলা রোগ (Haemorrhagic Septicaemia)

রোগের কারণঃ

এটি গরু-মহিষের একটি অত্যন্ত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। পাস্তুরেলা মালটোসিডা *(Pasteurella multocida)* নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া আক্রমণে এ রোগটি হয়। রোগজীবাণু সুস্থ পশুর নাকে বা গলায় বেঁধে থাকে। পরে নিঃশ্বাস বা খাদ্যের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে। রুগ্ন পশুর মলমূত্রের মাধ্যমে দুষিত খাদ্য খেয়ে বা পানীয় পান করেও সুস্থ পশু রোগাক্রান্ত হতে পারে।

রোগের লক্ষণঃ

১. পশুর দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়।
২. গলকম্বল থলথলে হয়ে ফুলে যায় এবং ফোলা জায়গা শক্ত থাকে, কিন্তু টিপ দিলে বসে যায়।
৩. গলা থেকে বুক পর্যন্ত এ ফোলা বিস্তার লাভ করে।
৪. পশুর শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটে ও পশু শব্দ করতে থাকে।
৫. জিহ্বা লাল হয়ে যায় ও খুব পিপাস হয়।
৬. শেষের দিকে পেট ব্যথা হয় ও পায়খানার সাথে রক্ত বের হয়।
৭. আক্রান্ত পশু পানাহার ছেড়ে দেয় ও জাবরকাটা বন্ধ হয়ে যায়।
৮. পশু গলা বাড়িয়ে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে চেষ্টা করে।
৯. চোখে প্রদাহ হয় বলে চোখ থেকে পানি পড়ে।
১০. ফোলা স্থানে সুচ দিয়ে ছিদ্র করলে হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ বের হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধঃ

১. রোগ লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শমতো নির্ধারিত মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। দেরি হলে কোন চিকিৎসায়ই কাজ কবে না।
২. রোগাক্রমণের পূর্বে পশুকে নিয়মিত রোগপ্রতিরোধক টিকা দিতে হবে।
৩. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. মৃত পশুকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
৫. রোগটি ছোঁয়াছে রোগ বলে আক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু থেকে আলাদা করে রাখতে হবে।

৪. বাছুরের সাদা বাহ্য রোগ (Calf Scour)

রোগের কারণঃ

সাধারণত জন্মের কয়েক দিনের মধ্যেই বাছুরের ব্যাকটেরিয়াজনিত এই মারাত্মক রোগটি হয়ে থাকে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কৃত্রিম খাবার ইত্যাদির মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু বিস্তার লাভ করে। গাভীর শাল দুধের অভাবে বা অনিয়মিত বা অধিক পরিমাণে দুধ বা অখাদ্য-কুখাদ্য খেলেও এ রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণঃ

১. বাছুর চাল ধোয়া পানির মতো সাদা পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত পায়খানা করতে থাকে।

২. নাভি ফোলে, পেটে ব্যাথা হয় ও হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়।
৩. দেহের তাপমাত্রা প্রথম দিকে বেড়ে গিয়ে পরে স্বাভাবিক হয়।
৪. ঘন ঘন পায়খানা করে, ফলে শরীরে পানি কমে যায়।
৫. বাছুর প্রথমে দুর্বল ও আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যায়।
৬. খাওয়া বন্ধ করে বাছুর শেষ পর্যন্ত মারা যেতে পারে।

রোগপ্রতিরোধঃ

১. জন্মের পরপরই বাছুরকে গাভীর শাল দুধ পান করানোর চেষ্টা করতে হবে।
২. স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. কোন জটিল সমস্যায় ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
৪. গাভীর প্রসব স্থান ও বাচ্চার বাসস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।

৫. বাছুরের নিউমোনিয়া (Pneumonia)

রোগের কারণঃ

এটি ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি সংক্রামক রোগ। প্রধানত ঠান্ডা পরিবেশে অল্প বয়সের বাছুরের এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগের অন্যান্য প্রচলিত নাম হল শ্বাস রোগ, পাঁজর ব্যথা ইত্যাদি।

রোগের লক্ষণঃ

১. বাছুর ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ও শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।
২. পশুর নাক দিয়ে সর্দি ঝরে ও শুকনো কাশি হয়।
৩. শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় ও হৃদপিন্ডের স্পন্দন দ্রুত হয়।
৪. শেষ পর্যায়ে পশু খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয় ও মারা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধঃ

১. আক্রান্ত পশুকে শুকনা ও পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে।
২. খড়ের বিচালি বা চট দিয়ে বাছুরের বিছানা করে দিতে হবে যাতে ঠান্ডা না লাগে।
৩. রোগাক্রান্ত পশুকে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করাতে হবে।
৪. রোগাক্রান্ত পশুর ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. গাভীর ওলান প্রদাহ বা ওলান পাকা (Mastitis)

রোগের কারণঃ

বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে গবাদিপশুতে এ রোগটি হতে পারে। ওলান বা বাঁটের কাটা ঘায়ের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। সাধারণত অধিক দুধ উৎপাদনকারী গাভী ও ছাগীতে এ রোগ হয়ে থাকে। অস্বাস্থ্যকর ও অপরিছন্ন স্যাঁতস্যাঁতে বাসস্থান, ময়লা হাতে দুধ দোহন, ওলানে বেশিক্ষণ দুধ জমে থাকা ইত্যাদি কারণে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণঃ

১. গাভীর ওলান ফুলে লাল হয়ে যায়।
২. হাত দিয়ে ওলান স্পর্শ করলে গরম অনুভব হয় ও পশু ব্যথা পায়।
৩. দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় ও ওলান শক্ত হয়ে যায়।
৪. দুধ ছানার মতো ছাঁকা ছাঁকা হয় ও দুধের সাথে রক্তও আসতে পারে।
৫. গাভীর দুধ কমে যায় ও ওলানের মধ্যে পুঁজের সৃষ্টি হয়।
৬. ওলান ও বাঁট ক্রমশ শক্ত হয়ে দুধ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।
৭. দুধ দোহন করলে দুধে রক্তাক্ত হলুদ বর্ণের তলানি পড়ে।

৮. পশু খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে নিস্তেজ হয়ে ঝিমাতে থাকে।
৯. অনেক ক্ষেত্রে রক্তদুষণ (Septecemia) হয়ে পশু মারাও যেতে পারে।
১০. ওলান ও বাটে অনেক সময় ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধঃ

১. স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে নিয়মিত দুধ দোহন করতে হবে।
২. পশুকে নরম ও পরিষ্কার বিছানায় থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. অপরিষ্কার হাতে দুধ দোহন করা যাবে না।
৪. গাভীর ওলান বা বাঁটে যাতে কোনভাবে ক্ষত সৃষ্টি না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
৫. ওলানে যাতে বেশি দুধ জমাট হবার সুযোগ না পায়, সেজন্য নিয়মিত দুধ দোহন করতে হবে।
৬. সমস্যা জটিল হলে প্রাণী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
৭. চিকিৎসার জন্য ওলানের সমস্ত দুধ বের করে তারপর বাটের মধ্যে দিয়ে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

৭. বাছুরের নাভিরোগ (Navel ill)

রোগের কারণঃ

স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেনস *(Streptococcus pyogenes)* ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে সাধারণত এ রোগটি হয়। নাভিরোগ বাছুরের জন্মের পরপরই হয়ে থাকে। বাচ্চা প্রসবের সময় বাচ্চার নাভির মাধ্যমে রোগজীবাণু সংক্রমিত হয়। প্রসবকৃত বাছুরের নাভি জীবাণুনাশক ময়লা ছুরি দিয়ে কাটার ফলে রোগজীবাণু ভেতরে প্রবেশ করে রোগের সৃষ্টি করে।

রোগের লক্ষণঃ

১. বাচ্চার নাভি ফুলে যায়, নাভিতে ব্যাথা হয় ও তাতে পুঁজ জমতে পারে।
২. বাছুরের দেহের রঙ বিভিন্ন রকমের হতে থাকে।
৩. বাচ্চার শরীর খিঁচিয়ে আসে।
৪. শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে বাচ্চা মারা যায়।
৫. বাচ্চা ধনুষ্টংকার রোগেও আক্রান্ড় হতে পারে।
৬. ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়।
৭. বিভিন্ন পায়ের এক বা একাধিক গিঁট ফুলে যেতে পারে।

রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসাঃ

১. বাচ্চা প্রসবের পর জীবাণুমুক্ত ধারালো ছুরি দিয়ে বাছুরের নাভি কাটতে হয়।
২. কাটা অংশ আয়োডিন দিয়ে মুছে জীবাণুনাশক পাউডার লাগাতে হয়।
৩. প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সালফোনোমাইডজাতীয় ওষুধ খাওয়াতে হবে বা অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন আকারে প্রদান করতে হবে।
৪. গাভীর প্রসবের স্থান পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।

গবাদিপশুর ছত্রাকজনিত রোগ

গবাদিপশুর ছত্রাকজনিত রোগের মধ্যে এদেশে দাদ বা রিংওয়ার্মই প্রধান। এখানে গবাদিপশুর দাদ রোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

দাদ (Ringworm)

কয়েক প্রজাতির ছত্রাক বা ফাংগাসের (Fungus) সংক্রমণে গবাদিপশুতে দাদ রোগ সৃষ্টি হয়। দাদ সাধারণত গোলাকৃতির হয় বলে একে রিংওয়ার্ম (Ringworm) বলে। সব প্রজাতির গবাদিপশুই এ ছত্রাকটি দিয়ে আক্রান্ত হতে পারে। তবে, গরু, ঘোড়া এবং কুকুর-বিড়ালে এর প্রাদুর্ভাব বেশি। দাদ সারা বছরই হতে পারে। তবে, শীতকালেই বেশি হতে দেখা যায়। সাধারণত ঘাড়, মাথা, কান ও মলদ্বারের চারপাশে দাদ বেশি হয়। কখনও কখনও পুরো দেহেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। সাধারণত বাছুরে এ রোগ বেশি হয়। দাদ অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। এ রোগ এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে এবং প্রাণী থেকে মানুষে স্পর্শের মাধ্যমে সহজেই সংক্রমিত হয়। গ্রামে প্রায় ৮০% দাদ গবাদিপশু বা প্রাণী থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়।

রোগের কারণঃ

Trichophyton verrucosum (ট্রাইকোফাইটন ভেরুকোসাম) গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াতে এবং *Microsporum canis* (মাইক্রোস্পোরাম কেনিস) কুকুর-বিড়ালে এ রোগ সৃষ্টি করে। । ঘোড়াতে দাদ সৃষ্টিকারী ছত্রাকের নাম *Trichophyton equinum* (ট্রাইকোফাইটন ইকুইনাম)।

লক্ষণঃ

১. ক্ষতস্থান অনেকটা ধূসর সাদা ও গোলাকার দেখায়।
২. চামড়ার গভীর অংশ আক্রান্ত হলে প্রদাহ এবং পুঁজও হতে পারে।
৩. আক্রান্ত স্থানের লোম পড়ে যায় এবং তার উপরে পুরু 'ছালট' পড়ে।
৪. গরুতে চোখের চারপাশে, কান, মুখবন্ধনি বা মাজেল (উপরের ঠোঁট) ও ঘাড়ে দাদ বেশি দেখা যায়।
৫. ঘোড়াতে এ রোগ বুক, পেট, পিছনের অংশ এবং পরবর্তীতে ঘাড়, মাথা ও বাহুতে হয়।
৬. কুকুর-বিড়ালে দাদ সাধারণত মাথা ও সামনের পায়ে হয়।

রোগ নির্ণয়ঃ

লক্ষণ দেখে দাদ নির্ণয় করা যায়। তবে চূড়ান্তভাবে নির্ণয়ের জন্য নমুনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ক্ষতস্থানের স্ক্র্যাপিং (Scraping) ও লোম অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করা যায়। সংগৃহীত নমুনা একটি কাঁচের স্লাইডে রাখা হয়। এতে কয়েক ফোটা ১০% পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH) মিশ্রণ করা হয়। এরপর উপরে একটা কভার স্লিপ দিয়ে কয়েক ঘন্টা রেখে দেয়া হয়।

চিকিৎসাঃ

দাদ চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ওষুধ রয়েছে। প্রথমে ক্ষতস্থান ভালোভাবে ব্রাশ করে নিতে হবে যেন উপরের পুরো ছালট পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শমতো ক্ষতস্থানে নিম্নলিখিত ওষুধগুলো লাগানো যেতে পারে। যেমন–

১. হুইটফিল্ড মলম
২. ১০% অ্যামোনিয়েটেড মার্কারি মলম
৩. কোয়ার্টারনারি অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড
৪. নেটাসাইসিন
৫. স্থানীয়ভাবে ওষুধ প্রয়োগের পাশাপাশি দাদের বিস্তৃতি বেশি হলে আক্রান্ত পশুর শিরায় ১০% সোডিয়াম আয়োডাইড ইনজেকশন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণঃ

পশুতে দাদ নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন। তবে নিচের পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা–

১. আক্রান্ত পশু থেকে অন্য পশুতে যাতে সংক্রমিত হতে না পারে সেজন্য আলাদা করে রাখতে হবে।

২. আক্রান্ত পশুর ঘর কার্বলিক অ্যাসিড বা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দ্রবণ দিয়ে নিয়মিত স্প্রে করতে হবে। ফরমালডিহাইড এবং সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডও একাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. খামারের সব গরু বা গবাদিপশুকে একই দ্রবণ দিয়ে সপ্তাহে দু'বার স্প্রে করতে হবে।

সারমর্ম

গবাদিপশু বিভিন্ন প্রকার ভাইরাসজনিত রোগ, যেমন– ক্ষুরা রোগ, পিপিআর, গোবসন্ত, জলাতঙ্ক ও বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এগুলো গবাদিপশুর উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে ফেলে। আবার ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ যেমন-তড়কা, বদলা, গলফোলা, কাফস্কুউর প্রভৃতি রোগে গরু/বাছুর প্রায়ই আক্রান্ত হয়ে থাকে। এগুলো প্রতিরোধের উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ ছাড়াও গবাদিপশু দাদ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. দাদ কোন ধরনের রোগ?
ক) ব্যাকটেরিয়াজনিত
খ) ভাইরাস জনিত
গ) ছত্রাকজাতীয়
ঘ) প্রোটোজোয়াঘটিত

২. *Bacillus anthracis* কোন ধরনের জীবানুর নাম?
ক) ক্ষুরা রোগ
খ) তড়কা রোগ
গ) বাদলা রোগ
ঘ) পিপিআর

৩. ক্ষুরা রোগ কোন ধরনের রোগ?
ক) পানিবাহিত
খ) ছোঁয়াছে রোগ
গ) বায়ু বাহিত
ঘ) অসংক্রামক রোগ

পাঠ ৮.৩

পরজীবীঘটিত ও অপুষ্টিজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গবাদিপশুর পরজীবীঘটিত রোগ সম্পর্কে বর্ননা করতে পারবেন।
- গবাদিপশুর অপুষ্টিজনিত রোগ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- অপুষ্টিজনিত রোগের কারণ ও পতিকার লিখতে পারবেন।

গবাদিপশুর পরজীবীজনিত রোগ (Parasitc Diseases of Livestock)

পরজীবীর ইংরেজি প্রতিশব্দ Parasite যা Para ও sitos এ দু'টো গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত। Para অর্থ পাশে এবং sitos অর্থ পুষ্টি। কাজেই উৎপত্তি ও ব্যবহারিক দিক থেকে যেসব প্রাণী অন্য প্রাণীদের উপর আশ্রয় নিয়ে তার থেকে খাদ্য গ্রহণ করে বেঁচে থাকে তাদেরকে পরজীবী বা Parasite বলে। পরজীবী যে জীবদেহের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, তাকে পোষক বলে। গবাদিপশুর অসংখ্য পরজীবী আছে যারা পোষকের কোন উপকার তো করেই না বরং ক্ষতি সাধন করে থাকে।

গবাদিপশুর পরজীবীগুলোকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়। যেমন-
১। দেহাভ্যন্তরের পরজীবী
২। বহিঃদেহের পরজীবী

এখানে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১। পশুর দেহাভ্যন্তরের পরজীজী (Endo-Parasite)

এদেশের গবাদিপশুর প্রায় ৮০%-ই দেহাভ্যন্তরের পরজীবী অর্থাৎ কৃমি দিয়ে আক্রান্ত হয়। এই কৃমিগুলো মূলত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা–
ক) গোল কৃমি
খ) ফিতা কৃমি ও
গ) পাতা কৃমি
এসব কৃমি দিয়ে আক্রান্ত গবাদিপশুর রোগ লক্ষণ ও চিকিৎসা বা প্রতিকার এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

ক) গোল কৃমি (Round Wrom)

> গোল কৃমি দেখতে অনেকটা কেঁচোর মতো গোল।

গোল কৃমি নানা ধরনের হয়ে থাকে, যেমন– পাকস্থলীর বড় কৃমি, পাকস্থলীর ছোট বাদামি কৃমি, ছোট চুল কৃমি, বক্রকৃমি, সুতাকৃমি ইত্যাদি। গোল কৃমি দেখতে অনেকটা কেঁচোর মতো গোল। এসব গোল কৃমি গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার পাকস্থলী, অন্ত্রনালী, শ্বাসতন্ত্র ও অন্যান্য অংশে বাস করে এবং সেসব জায়গায় ডিম পাড়ে। গবাদিপশু যখন পায়খানা করে, তখন পায়খানার সঙ্গে সে ডিম বের হয়ে মাটিতে পড়ে। আর অনুকূল পরিবেশে সেসব ডিম থেকে লার্ভা (Larva) বা শূককীট বের হয়। কিছু কিছু কৃমির এই শূককীটগুলো মাটি, ঘাসের পাতা

প্রভৃতিতে লেগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পরজীবীতে রূপান্তরিত হয়। অন্যদিকে, কিছু কিছু কৃমির শূককীট অন্য পোষক প্রাণীর মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে আবার প্রাণীর মলের মাধ্যমে বের হয়ে এসে ঘাস–পাতায় লেগে থাকে। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই শূককীটগুলোকে গবাদিপশু ঘাস-পাতার সঙ্গে খেয়ে ফেলে। ফলে এগুলো পশুর পাকস্থলী ও অন্ত্রনালীতে গিয়ে পূর্ণবয়স্ক পরজীবীতে পরিণত হয়। এভাবে কৃমি তাদের বংশবৃদ্ধি করে থাকে।

গোলকৃমি দিয়ে আক্রান্ত পশুর লক্ষণঃ

১. পশুর ক্ষুদামন্দা দেখা দেয়, শরীরের ওজন ক্রমশ কমতে থাকে।
২. মাঝে মধ্যে পাতলা পায়খানা হয়।
৩. শরীরের লোম রুক্ষ দেখায়।
৪. কৃমি পশুর রক্ত চুষে খায় বলে পশুকে রক্তশূণ্য দেখায়।
৫. বড় গোলকৃমি পশুর অন্তনালীতে অনেকগুলো একত্রে জড়ো হয়ে অন্তনালীর পথ বন্ধ করে দেয়, ফলে পশু মারা যেতে পারে।
৬. কৃমি পশুর পেটে অবস্থান করে পশুর পুষ্টিতে ভাগ বসায়। ফলে পশু পুষ্টিহীনতায় ভোগে।

গোলকৃমির চিকিৎসা বা প্রতিকারঃ

১. কৃমি আক্রান্ত পশুকে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক রালনেক্স, ফেসিনেক্স, নেমাফক্স, মেবেনডাভেট ইত্যাদি কৃমিনাশক বড়ি খাওয়াতে হবে।
২. বাছুরের বয়স তিন মাস হলে তাকে নিয়মিত কৃমিনাশন ওষুধ খাওয়াতে হবে।
৩. গোশালার আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার করে সুরক্ষিতভাবে গর্তে রাখতে হবে।
৪. কাদা পানিযুক্ত বা স্যাঁতস্যাঁতে মাঠে পশুকে ঘাস খাওয়ানো যাবে না।
৫. গোয়াল ঘর শুকনা রাখতে হবে।

খ) ফিতা কৃমি (Tape worm)

সব ধরনের গবাদিপশুতেই ফিতাকৃমির আক্রমণ হয়ে থাকে। ফিতাকৃমির অনেকগুলা প্রজাতি রয়েছে। এরা পশুর অন্তনালীতে বাস করে। এই কৃমি দেখতে ফিতার মতো এবং লম্বায় প্রায় ১৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের দেহ অনেকগুলো অংশে ভাগ করা থাকে, যাকে প্রগ্লোটিড (Progllotid) বলে। কৃমির মাথায় শোষক যন্ত্র ও বড়শি থাকে। এই কৃমির জীবনচক্র মাধ্যমিক পোষকের (Intermediate host) (শামুক) মধ্যে হয়ে থাকে। প্রগ্লোটিড যখন পূর্ণবয়স্ক হয় তখন মলের সাথে মাটিতে বেরিয়ে আসে এবং প্রগ্লোটিডগুলো ফেটে গিয়ে ডিম বের হয়। মাধ্যমিক পোষক খাদ্যের সঙ্গে এসব ডিম খেয়ে ফেলে। মাধ্যমিক পোষকের দেহাভ্যন্তরে ডিম হতে শূককীট এবং তারপর জলকোষ (Cysticercus) হয়। গবাদিপশু এসব জলকোষসহ মাধ্যমিক পোষক খেয়ে ফেলে। তারপর পশুর অন্ত্রে গিয়ে জলকোষ ফেটে ফিতাকৃমি বের হয় এবং সেখানে জীবনধারণ করতে থাকে।

> ফিতাকৃমি দেখতে ফিতার মতো এবং লম্বায় প্রায় ১৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ফিতাকৃমিতে আক্রান্ত গবাদি পশুর লক্ষণঃ

১. প্রাপ্তবয়স্ক গরু-মহিষে ফিতাকৃমির আক্রমণ কম হলেও বাছুরে কিছুটা বেশি হয়ে থাকে।
২. কৃমির কারণে গবাদিপশুর হজমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।
৩. গবাদিপশুর মাঝে মধ্যে পেটফোলা ও উদরাময় হয়।
৪. ছাগল ভেড়ার মস্তিষ্কে কৃমির শূককীট জলকোষ সৃষ্টি করে। এতে পশুর গিঁট নামক রোগ হয়।

৫. পশু মাঝে মধ্যে বাঁকা করে ঘুরতে থাকে।
৬. গিঁট আক্রান্ত স্থানে পশুর হাড় নরম হয়ে যায়।
৭. আক্রান্ত হাড়ে আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করলে পশু ব্যথায় চিৎকার দেয়।

ফিতাকৃমির চিকিৎসা বা প্রতিকারঃ

ফিতাকৃমিতে আক্রান্ত পশুর চিকিৎসা গোলকৃমির মতোই। তবে জলকোষ সৃষ্টি হলে সার্জারি করে বের করে ফেলতে হয়।

গ) পাতাকৃমি (Liver fluke)

এ কৃমিগুলো দেখতে অনেকটা পাতার মতো চ্যাপ্টা বলে এদের নাম হয়েছে পাতাকৃমি। এদের দু'টো সাকার (sucker) বা শোষক আছে। সাকারের মাধ্যমে এরা পোষকের অঙ্গে আটকে থাকে। গবাদিপশু প্রধানত তিন ধরনের পাতা কৃমিতে আক্রান্ত হয়। যথা–

১. যকৃতের পাতা কৃমি (Liver fluke)
২. পাকস্থলীর পাতা কৃমি (Stomach fluke) এবং
৩. রক্তের পাতা কৃমি (Blood fluke)

পাতাকৃমির জীবনচক্র (Life Cycle of Fluke)

পাতাকৃমির জীবনচক্রের মাধ্যমিক পোষক হল শামুক। যকৃত পাতাকৃমিগুলো পিত্তনালীতে থাকে। সেখানে কৃমি প্রচুর পরিমাণে ডিম পাড়ে, যা পরবর্তীতে মলের সাথে বেরিয়ে আসে। উপযুক্ত পরিবেশে ডিম থাকে লার্ভা বা শূক বের হয়। শূক চারণক্ষেতের শামুকে প্রবেশ করে আস্তে আস্তে বয়স্ক শূকে পরিণত হয়। শামুক থেকে বের হয়ে পুনরায় জলাভূমিতে ঘাস পাতায় প্রবেশ করে। গবাদি পশুর ঘাস খাবার সময় ঘাসের সাথে সে সব শূক পশুর অন্ত্রে প্রবিষ্ট হয়। অন্ত্রনালী হতে বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে সে সব শূক যকৃতে প্রবেশ করে। কিছুদিন যকৃতে অবস্থান করার পর পিত্তনালীতে প্রবেশ করে এবং সেখানে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে ডিম পাড়ে।

পাকস্থলীর পাতা কৃমি পাকস্থলীতে ডিম পাড়ে এবং যকৃত কৃমির মতোই তার জীবনচক্র সম্পন্ন করে।

পাকস্থলীর পাতা কৃমি পাকস্থলীতে ডিম পাড়ে এবং যকৃত কৃমির মতোই তার জীবনচক্র সম্পন্ন করে। রক্তের পাতাকৃমি গবাদিপশুর নাকের শিরায় বাস করে এবং সেখানে ডিম পাড়ে। সেখান থেকে ডিম পরিপাকতন্ত্রে গিয়ে মলের সাথে বের হয়ে যায়। তারপর অন্যান্য পাতা কৃমির মতই শামুকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ঘাসের সাথে পশুর অন্ত্র নালীতে যায়। অন্ত্রনালী থেকে বিভিন্ন পথে নাকের শিরায় এসে পৌঁছায় এবং সেখানে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে ডিম পাড়ে।

পাতাকৃমিতে আক্রান্ত পশুর লক্ষণঃ

১. যকৃতের পাতাকৃমির আক্রমণে যকৃত পিত্তনালীসহ বিভিন্ন অঙ্গে প্রদাহ হয়।
২. পশুর হজমে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, পশু দুর্গন্ধযুক্ত ও রক্ত মিশ্রিত তরল মল নির্গত করে।
৩. পশু দুর্বল হয়ে কর্মশক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতাহীয় হয়ে পড়ে।
৪. পাকস্থলীর পাতা কৃমির আক্রমণে দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত মিশ্রিত তরল পায়খানা হয়।
৫. শরীরে রক্ত কমে যাওয়ায় পশু রক্তহীন দেখায়।
৬. আক্রান্ত পশুর থুঁতনির নিচে ফোলা দেখা যায়।
৭. রক্তের ফিতা কৃমির আক্রমণে রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নাক হতে শ্লেষ্মার সাথে রক্ত পড়ে।
৮. নাসারন্ধ্রে গোটা হয়ে নাকের ছিদ্র পথ বন্ধ হয়ে যায় বলে পশুর শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং ঘড়ঘড় শব্দ হয়।
৯. পশুর খাওয়া কমে যায় এবং রক্তহীন হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যায়।
১০. যকৃত পাতা কৃমির আক্রমণে যকৃত ও পিত্তনালীতে প্রদাহ হয়।
১১. নাসারন্ধ্রে গোটা ওঠে নাকের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়।

১২. বাছুরের অধিক আক্রমণ হলে বাছুর মারা যায়।

পাতাকৃমির চিকিৎসাঃ

১. ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক বিভিন্ন কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে।
২. মধ্য পোষক অর্থাৎ শামুক ধ্বংস করার জন্য তুঁতে ব্যবহার করা যায়।
৩. পশু যাতে স্যাঁতসেঁতে জলাভূমিতে ঘাস না খায় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

২। গবাদিপশুর বহিঃদেহের পরজীবী (External Parasites)

গবাদিপশুতে বহু ধরনের বহিঃদেহীয় বা বহিঃপরজীবীর আক্রমণ হয়ে থাকে। এসব পরজীবী পশু ত্বকে বাস করে চামড়ার বিশেষ ক্ষতি করে থাকে। পশুর বহিঃদেহের পরজীবীগুলো হল ঃ আঠালী, উকুন, মাছি, মাইটস, কেডস এবং ফ্লি।

গবাদিপশুর উল্লেখযোগ্য বহিঃপরজীবীর পরিচিতি, ক্ষতির ধরন ও দমন পদ্ধতি এখানে আলোচিত হয়েছে।

ক) উকুন (Louse)

উকুন সব ধরনের গবাদিপশুকে আক্রমণ করে থাকে। মূলত আমাদের গবাদিপশুগুলোকে দুই ধরনের উকুন পাওয়া যায়। যেমন- ১) কামড়ানো উকুন ও ২) রক্ত চোষা উকুন।

১. কামড়ানো উকুনঃ কামড়ানো উকুন সাধারণত কুঁজের উপর এবং লেজের গোড়ার চারদিকে বাস করে। একটি প্রাপ্তবয়স্ক কামড়ানো উকুন সর্বাধিক ৪২ দিন বাঁচে এবং এ সময়ের মধ্যে তারা ৩০টির মত ডিম পাড়ে। এ উকুনের কারণে পশুর শরীর খুব চুলকায় বলে পশু শক্ত জিনিসের সাথে তার গা ঘষে।

২. রক্তচোষা উকুনঃ উরুদেশের ভেতরে, লেজের গোড়ায়, মাথায়, নাক, চোখ ও কানের চারপাশে জমাট বেঁধে আটকে থাকে। এসব উকুন গবাদিপশুর দেহের রক্ত চুষে খায় বলে পশুকে রক্তশূন্য দেখায়।

উকুনের কারণে পশুর শরীর বাড়ে না, দুধ কমে যায় এবং কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে। বিভিন্ন ধরনের উকুননাশক ওষুধ ব্যবহার করে উকুন মারা যায়। তাছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালনের মাধ্যমে গবাদিপশুকে এ ধরনের পরজীবী থেকে মুক্ত রাখা যায়।

খ) মাছি (Flies)

মাছির উপদ্রবে গবাদিপশুর খাওয়া-দাওয়া কমে যায় এবং দুধ উৎপাদন হ্রাস পায়।

গবাদিপশুকে আক্রমণকারী মাছিগুলো হলো আস্তাবলের মাছি, মহিষের মাছি, ঘোড়ার মাছি, উড়ন্ত মাছি ইত্যাদি। অনেক মাছি পশুর দেহে কামড় দিয়ে রক্ত চুষে খায়। অন্যরা পশুর দেহের ক্ষতে ডিম পাড়ে। যেসব ডিম থেকে শূককীট বের হয়ে ক্ষতে পচন সৃষ্টি করে উক্ত ক্ষতে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু সংক্রমিত হয়ে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করে। আবার অনেক ঘায়ে মাছি বসে চুলকানির সৃষ্টি করে। সেসব জায়গায় গবাদিপশু জিহ্বা দিয়ে অতিরিক্ত চাঁটাচাঁটি করার কারণে ঘায়ের সৃষ্টি হয়। মাছির উপদ্রবে গবাদিপশুর খাওয়া-দাওয়া কমে যায় এবং দুধ উৎপাদন হ্রাস পায়।

ঘরবাড়ি ও গবাদিপশুর বাসস্থান পরিষ্কার রাখাই মাছি কমানোর সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। জীবাণুনাশক দিয়ে ঘরের মেঝে ও পশুর দেহ ধুয়ে দিলে মাছির উপদ্রব কমে যায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে মাছির উপদ্রব কমানো যায়।

গ) আটালি (Ticks)

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়াসহ প্রায় সকল গবাদিপশুই আঁটালি দিয়ে আক্রান্ত হয়। বহিঃপরজীবীর মধ্যে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এই পদ্ধতি গবাদিপশুর ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। পশুর দেহে বিভিন্ন ধরনের আটালির আক্রমণ হতে পারে। আমাদের দেশের যে আটালি পোকাটি বেশি হয়ে থাকে তার নাম হল *বুফিইলাস-মাইক্রোপ্লাস*। আঠালি, প্রটোজোয়াসহ বিভিন্ন রোগের জীবাণু সুস্থ পশুতে সংক্রমণ করে রোগ সৃষ্টি করে।

আটালি দিয়ে আক্রান্ত পশুর লক্ষণঃ

১. আটালি গবাদিপশুর ত্বকের রক্ত চুষে পান করে বলে রক্তশূণ্যতা হয়।
২. গবাদিপশু আক্রান্ত স্থান শক্ত কিছুর সাথে ঘষে বলে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
৩. আক্রান্ত পশু খুব অস্বস্তি বোধ করে।
৪. গাভীর দুধ প্রদান কমে যায়।

ঘ) মাইট (Mites)

অতি ক্ষুদ্র ছাপপোকাজাতীয় এ পরজীবীগুলো গবাদিপশুর দেহে সংক্রামক চর্মরোগের সষ্টি করে। এ পরজীবীগুলো আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শের মাধ্যমে বা তাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মাধ্যমে সুস্থ পশুতে সংক্রমিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগের সৃষ্টি করে। আক্রান্ত পশু বিরক্তবোধ করে। পশুর দেহ চুলকায় বলে তারা শক্ত কিছুর সাথে গা ঘষে। ফলে চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পশুর রক্ত হ্রাস পাওয়ায় স্বাস্থ্যহানী ঘটে।

বহিঃদেহীয় পরজীবীর প্রতিকার

গবাদিপশুর বহিঃপরজীবীর প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা-

১. ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক বিভিন্ন ওষুধ বাহ্যিকভাবে চামড়ায় ব্যবহার করতে হবে।
২. ঘরের মেঝে এবং আশপাশ ফিনাইল, নেগুভন ইত্যাদি ওষুধ মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।
৩. গবাদিপশুকে নিয়মিত শরীর ঘসেমেজে গোসল করাতে হবে।
৪. আলো বাতাসযুক্ত খোলামেলা জায়গায় পশুর বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. আক্রান্ত পশুর বহিঃদেশ চিরুনি দ্বারা আঁচড়িয়ে পরজীবী মুক্ত করা যায়।

গবাদিপশুর প্রোটোজোয়াজনিত রোগ

প্রোটোজোয়াজনিত রোগগুলো হলো ব্যাবেসিওসিস, অ্যানাপ্লাজমোসিস, ককসিডিওসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস ইত্যাদি।

এ রোগ প্রোটোজোয়া নামক একপ্রকার এককোষি আদি জীবাণু দিয়ে সংঘটিত হয়। এ রোগের জীবাণু গবাদিপশুর দেহে আটালি কর্তৃক সৃষ্ট ক্ষতের মাধ্যমে সুস্থ দেহে সংক্রমিত হয়। প্রোটোজোয়াজনিত রোগগুলো হলো ব্যাবেসিওসিস, অ্যানাপ্লাজমোসিস, ককসিডিওসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস ইত্যাদি। এখানে এসব রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

১. ব্যাবেসিওসিস (Babesiosis)

রোগের কারণঃ

ব্যাবেসিয়া নামক একপ্রকার প্রোটোজোয়া দিয়ে গবাদিপশুর এ রোগ হয়ে থাকে। আটালি দিয়ে পশুদেহে সৃষ্ট ক্ষতের মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু পশুর দেহে প্রবেশ করে রোগের সৃষ্টি করে। এ রোগের প্রচলিত নাম রক্ত প্রস্রাব বা রেড ওয়াটার রোগ।

রোগের লক্ষণঃ

১. এ জীবাণুর আক্রমণে পশুর রক্তের লোহিত কণিকা ভেঙে যায়। এ কারণে প্রস্রাবের রং লাল হয়।
২. আক্রান্ত পশুর দেহের তাপমাত্রা ও নাড়ির স্পন্দন বেড়ে যায়।
৩. প্রাণীর মধ্যে রক্তশূন্যতা দেখে দেয় ও সে শ্বাসকষ্টে ভোগে।
৪. পশুর হঠাৎ জ্বর হয়।
৫. জাবরকাটা বন্ধ করে দেয়।
৬. সময়মত চিকিৎসা না হলে পশু মারা যায়।

রোগের চিকিৎসাঃ

১. পশুর বাসস্থান পরিষ্কার রাখতে হবে।
২. বোরিক পাউডার ও ফিটকিরির পানি খাওয়ালে উপশম হয়।
৩. এ রোগের লক্ষণ দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা করাতে হবে।

আইমোরিয়া (Eimeria) নামক প্রোটোজোয়া দিয়ে এ রোগ সৃষ্টি হয়।

২। রক্ত আমাশয় বা ককসিডিওসিস (Coccidiosis)

রোগের কারণঃ

আইমোরিয়া (Eimeria) নামক প্রোটোজোয়া দিয়ে এ রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগ ৬-১২ মাস বয়সের পশুদের বেশি হয়ে থাকে। খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু অন্ত্রনালীতে প্রবেশ করে খাদ্যনালীতে ঘায়ের সৃষ্টি করে। স্যাঁতস্যাঁতে নিচু জায়গা এ রোগ বিস্তারের জন্য অনুকূল।

রোগ লক্ষণঃ

১. আক্রান্ত পশুর পায়খানা দুর্গন্ধযুক্ত এবং রক্ত মিশ্রিত হয়।
২. পায়খানার সাথে দলাদলা রক্ত বের হয়।
৩. মলত্যাগের সময় পশুকে কোঁথ দিতে হয় বলে পশু ব্যথা অনুভব করে।
৪. দেহের জলীয় অংশ কমে যাওয়ায় পশুকে রক্তশুন্য দেখায়।
৫. পশু খাওয়া বন্ধ করে কয়েক দিনের মধ্যে মারা যায়।
৬. হঠাৎ করে পাতলা পায়খানা শুরু করে।
৭. শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

রোগপ্রতিরোধঃ

১. পশুকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে লালন-পালন করা, ভালো খাবার দেয়া রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায়।
২. আক্রান্ত পশুর ঘর এবং আসাবাবপত্র ফরমালডিহাইড সলুশন দ্বারা ধৌত করে দেয়া ভাল।
৩. পশুর বাসস্থান সর্বদা শুষ্ক ও ঠান্ডা রাখতে হবে।
৪. আক্রান্ত পশুর বিছানাপত্র পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৩। ট্রাইকোমোনিয়াসিস *(Trichomoniasis)*

রোগের কারণঃ

এ মারাত্মক রোগটি *ট্রাইকোমোনাস ফিটাস* নামক এ জাতীয় প্রোটজোয়া দ্বারা হয়ে থাকে। এ রোগের ফলে পশুর গর্ভপাত,অস্থায়ী প্রজননহীনতা এবং অন্যান্য বহু প্রজননঘটিত যৌন সমস্যা

দেখা দেয়। যৌন মিলনের সময় আক্রান্ত পশু দ্বারা এ রোগ সংক্রমিত হয়। ষাঁড় একবার এ জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হলে সারা জীবন উক্ত রোগের জীবাণু ধরে রাখে।

রোগের লক্ষণঃ

এ রোগে আক্রান্ত গাভীর গর্ভধারণের ১-৪ মাসের মধ্যে গর্ভপাত হয়। যেমন-

১. ষাঁড় এবং গাভী উভয়ের যৌনাঙ্গে প্রদাহ হয়।
২. ষাঁড়ের লিঙ্গ ফুলে যায়, লাল এবং প্রদাহযুক্ত।
৩. গাভীর যোনিমুখ ফুলে যায় এবং লাল দেখায়।
৪. বকনা বা গাভীর ঋতুচক্র অনিয়মিতভাবে হয়।
৫. রোগের জটিল অবস্থায় গাভীর জরায়ুতে পুঁজ হয়।

রোগের প্রতিকার বা চিকিৎসা ঃ

১. কিছুদিন গাভীর যৌন সঙ্গম বন্ধ রাখতে হবে।
২. জীবাণুমুক্ত ষাঁড় দিয়ে প্রজনন করাতে হবে।
৩. কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এ রোগ এড়ানো যায়।
৪. রোগের জটিল অবস্থায় প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

পশুর অপুষ্টিজনিত রোগ (Nutritional Diseases of Livestock)

গবাদিপশুর খাদ্যে সুষম উপাদানের অভাব হলে পশু পুষ্টিহীনতায় ভোগে এবং ক্রমে কর্মক্ষমতা ও উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এগুলো হলো–

১. ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ
২. খনিজ পদার্থের অভাবজনিত রোগ।

এখানে এদের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১. গবাদিপশুর ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ (Vitamin Dericiency Diseases)

সাধারণত গবাদিপশুর নিম্নলিখিত ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণগুলোর অভাবজনিত রোগ দেখা যায়; যথা:

ক) ভিটামিন 'এ'
খ) ভিটামিন 'ডি'
গ) ভিটামিন 'ই'
ঘ) ভিটামিন 'কে'
ঙ) ভিটামিন 'বি$_{১২}$'

ক) ভিটামিন 'এ'

> ভিটামিন 'এ' চর্বিতে দ্রবণীয় কিন্তু পানিতে দ্রবনীয় নয়।

ভিটামিন 'এ' চর্বিতে দ্রবণীয় কিন্তু পানিতে দ্রবনীয় নয়। সবুজ ঘাস, সবুজ লতাপাতা এবং শাকসবজিতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন 'এ' থাকে। মাঠে চরে যেসব পশু উপরিউক্ত সবুজ ঘাস ও লতাপাত খায়, তাদের ভিটামিন 'এ' এর অভাব হয় না। পশুকে কেবলমাত্র খড় ও দানাদার খাদ্য খাওয়ালে সেসব পশুতে ভিটামিন 'এ' এর অভাব হয়। পশুর যকৃতে ভিটামিন 'এ' প্রচুর পরিমাণে থাকে বলে যকৃত রোগে ভিটামিন 'এ' এর অভাব দেখা দেয়।

অভাবজনিত লক্ষণঃ

১. এই ভিটামিনের অভাবে পশুরাত্রে দেখে না বা অল্প দেখে।
২. 'এ' ভিটামিনের অভাব বেশি হলে পশুর মাংসপেশীর অসামঞ্জস্য দেখা দেয়।

৩. এতে পশুর হাঁটা চলায় অসুবিধা হয়।
৪. 'এ' ভিটামিনের অভাবে পশুর চামড়া খসখসে ও লোম রুক্ষ হয়।
৫. পশুর চোখ ফুলে যায় এবং চোখে সাদা পিঁচুটি জমে।
৬. সময়মত সঠিক চিকিৎসা না করলে পশু অন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিকারঃ

ভিটামিন 'এ' এর অভাব হলে পশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে। দানাদার খাবারের সাথে কৃত্রিম ভিটামিন 'এ' মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। জন্মের পরপরই বাছুরকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে।

খ) ভিটামিন 'ডি'

এই ভিটামিন পানিতে দ্রবণীয় নয়, তবে চর্বিতে দ্রবণীয়। দেহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের স্বল্পতার কারণে ভিটামিন 'ডি' এর অভাব হয়। পশুর দেহে সূর্যরশ্মি পড়ে ভিটামিন 'ডি' তৈরি হয়। যেসব পশু মাঠে চড়ে বেড়ানোর সময় প্রচুর সূর্যালোক পায়, তাদের ভিটামিন 'ডি'-এর অভাব হয় না।

অভাবজনিত লক্ষণঃ

১. এই ভিটামিনের অভাবে বাছুরের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত হয় না।
২. হাড় নরম হয়ে বেঁকে যায়, যাকে রিকেট্স বলে।
৩. পশুর ক্ষুধাহীনতা দেখা দেয়।
৪. পশু না খাওয়ার কারণে ক্রমশ দুর্বল ও কর্মক্ষমহীন হয়ে পড়ে।
৫. পশুর প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

প্রতিকারঃ

পশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যালোক পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পশুর দানাদার খাবারের সাথে সামুদ্রিক মাছের যকৃতের তেল মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। তাছাড়া খাবারের সাথে কৃত্রিম ভিটামিন 'ডি' মিশিয়ে খাওয়ালে অভাব অনেকটা পূরণ করা যায়।

গ) ভিটামিন 'ই'

এই ভিটামিন পানিতে দ্রবনীয় কিন্তু চর্বিতে দ্রবণীয় নয়। এই ভিটামিনের ইংরেজি নামা ইফাইনল। টাটকা সবুজ ঘাস, লতাপাতা, অঙ্কুরিত শস্যদানা ও অঙ্কুরিত ডাল শস্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'ই' পাওয়া যায়।

অভাবজনিত লক্ষণঃ

১. এই ভিটামিনের অভাবে বাছুরের মাংসপেশীর শৈথিল্য দেখা দেয়।
২. অস্থির মাংসপেশীর সংকোচন, অস্বাভাবিক চলাফেরা।
৩. প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

প্রতিকারঃ

গবাদিপশুকে নিয়মিত কাঁচা ঘাস, লতাপাতা ও অঙ্কুরিত দানা জাতীয় শস্য খাওয়াতে হবে। দানাদার খাবারে সাথে কৃত্রিম ভিটামিন খাওয়ালে গাভী ও তার দুধের মাধ্যমে বাচ্চা প্রয়োজনীয় ভিটামিন 'ই' পাবে।

ঘ) ভিটামিন 'কে'

এই ভিটামিন পানিতে দ্রবণীয়। ভিটামিন 'কে' প্রোথ্রোমবিন গঠন করে, যা রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। সবুজ ও কাঁচা ঘাসে এই ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পশুর

পরিপাকতন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার সংশ্লেষণের ফলে প্রয়োজনীয় ভিটামিন 'কে' তৈরি হয়। এই ভিটামিনের অভাব হলে পশুর রক্তের প্রোথ্রোমবিন কমে যায় বলে পশুর রক্তক্ষরণ বন্ধে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

প্রতিকারঃ

গবাদিপশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাস খেতে দিয়ে এবং প্রয়োজনে কৃত্রিম ভিটামিন প্রদান করে এ অভাব মিটানো যায়।

ঙ) ভিটামিন 'বি$_{১২}$'

ভিটামিন 'বি$_{১২}$' শুঁটকি মাছ, মাংস, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য, পশু ও মুরগির লিভারে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'বি$_{১২}$' শুঁটকি মাছ, মাংস, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য, পশু ও মুরগির লিভারে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। পশুর শরীরে ক্ষুদ্র অণুজীব দ্বারা এই ভিটামিন তৈরি হয়। এই ভিটামিনের অভাব বয়স্ক পশুর মধ্যে বেশি পরিলক্ষিত হয়। এর অভাবে পশুর রক্তশূণ্যতা দেখা দেয় ও শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

প্রতিকারঃ

পশুর খাদ্যে উপরোক্ত ভিটামিনযুক্ত খাবার যোগ করে এবং প্রয়োজনে কৃত্রিম ভিটামিন প্রয়োগ করে এ অভাব মিটানো যায়।

২. গবাদিপশুর খণিজ পদার্থের অভাবজনিত রোগ (Mineral Deficiency Diseases)

গবাদি পশুর শরীরে খনিজ পদার্থের মধ্যে ফসফরাস ও ক্যালসিয়ামের অভাবই বেশি পরিলক্ষিত হয়। অধিক দুধ প্রদানকারী গাভীর শরীরে যে পরিমাণে ফসফরাস পরিশোধিত হয়, তার চেয়ে বেশি দুধের সাথে বের হয়ে যায়। ফলে গাভীতে ফসফরাসের অভাব দেখা দেয়।

অভাবজনিত লক্ষণঃ

১. ফসফরাসের অভাবে পশুর দৈহিক বৃদ্ধি ভাল হয় না।
২. দুধ কমে যায়, গর্ভধারণ হ্রাস পায়।
৩. পশুর অস্বাভাবিক ক্ষুধা পায়, গাভী দুর্বল বাছুর জন্ম দেয়।
৪. প্রসবের পর বাচ্চার রিকেটস রোগ হয়।
৫. ক্যালসিয়ামের অভাবে পশুর হাড়ের বৃদ্ধি হয় না।
৬. তীব্র সংকটে গাভীর দুধ জ্বর হয়।
৭. বাচ্চার হাড় বেঁকে রিকেট্স রোগ হয়।
৮. বয়স্ক পশুর অস্থিতে কোমলতা দেখা দেয়।
৯. সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরিন ইত্যাদি খনিজ পদার্থের অভাবে পশুর সাধারণ দুর্বলতা, অনুর্বরতা, রুক্ষত্বক, রক্ত শূণ্যতা, হাঁড়ের কোমলতা ইত্যাদি দেখা যায়।
১০. গবাদিশুর উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়া, দৈহিক অবস্থার অবনতি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

প্রতিকারঃ

১. গবাদিপশুকে সুষম খাবার বিশেষ করে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে।
২. দানাদার খাবারের সাথে হাড়ের গুঁড়া, লবণ এবং অন্যান্য খনিজ মিশ্রণ মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
৩. পশু খাদ্যে ডাইক্যালসিয়াম ও ডাইসোডিয়াম ফসফেট মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

সারমর্ম

আমাদের দেশের গবাদিপশু প্রায়শই পরজীবিঘটিত ও অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়। এতে করে গবাদিপশুর উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় এবং খামারি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন প্রকার পরজীবির কৃমি ও প্রোটোজোম, গবাদিপশুর উৎপাদন ক্ষমতা মারাত্নকভাবে কমিয়া ফেলে। এছাড়া উকুন, আটলি, মাছি ও গবাদিপশুর উৎপাদন ব্যহত করে। এছাড়া গবাদিপশু বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনও খনিজপদার্থের অভাবে পুষ্টিহীনতায় ভূগে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ফিতাকৃমি লম্বায় কতফুট হয়ে থাকে?
ক) ১০ ফুট খ) ১৫ ফুট
গ) ২০ ফুট ঘ) ২৫ ফুট

২. আইমেরিয়া নামক প্রোটোজোয়া কোন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে?
ক) রক্ত আমাশয় খ) বসন্ত
গ) দাদ ঘ) ক্ষুরা রোগ

৩. কোন ভিমিন প্রোথ্রোম্বিন তৈরি করে?
ক) ভিটামিন 'এ'
খ) ভিটামিন 'ই'
গ) ভিটামিন 'কে'
ঘ) ভিটামিন 'বি$_1$'

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৮

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১. রোগ বলতে কী বুঝেন?
২. ব্যাকটেরিয়াল,ভাইরাল ও প্রোটোজোয়া ঘটিত তিনটি করে রোগের নাম লিখুন।
৩. ঘোড়ার নাড়ির গতি কিভাবে নির্ণয় করা হয়?
৪. ক্ষুরা রোগ কি? এ রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা বর্ণনা করুন।
৫. জলাতংক ও পিপিআর রোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৬. বাদলা ও গলাফোলা রোগের লক্ষণ বর্ণনা করুন।
৭. কাফ স্কাওর রোগ কী?
৮. গোল কৃমি ও ফিতা কৃমির মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
৯. পাতাকৃমির জীবন চক্র বর্ণনা করুন।
১০. প্রাণিদেহে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' এর অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ করুন।